বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক র‍্যাংকিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

চৌধুরী মুফাদ আহমদ

প্রতিবছরই কয়েকটি প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের র‍্যাকিং প্রকাশ করে। এসব র‍্যাংকিংয়ে আমাদের দেশের নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম না থাকায় বা হতাশাজনক অবস্থানে থাকায় মিডিয়ায় সমালোচনার তুমুল ঝড় ওঠে। কয়েকদিন আগে 'টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২০' প্রকাশিত হয়েছে। এই র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের ৯২টি দেশের ১৪০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থানে আছে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আর একসময়ের 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ১০০১-এর পর! র‍্যাংকিং নিয়ে সিদ্ধান্তে আসার আগে আরও কিছু বিষয় জেনে নেয়া দরকার। এই লেখায় সেই চেষ্টাই করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশ্বিক র‍্যাংকিং পুঁজিবাদী বৈশ্বিকায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত। কারণ উচ্চশিক্ষার একটি বৈশ্বিক চরিত্র ও মূল্য আছে। উচ্চশিক্ষাকে ক্রমান্বয়ে নব্য-উদারবাদীকরণের বা neo- liberal ization- এর প্রবণতার সঙ্গেও এর যোগসূত্র আছে। এর সঙ্গে যোগসূত্র আছে সারা বিশ্ব থেকে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মেধা পাচারের, ব্যবসার বিষয়টিও। এরকম র‍্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এমন একটি ধারণা তৈরি করা হচ্ছে যে, উচ্চশিক্ষার 'তীর্থস্থান' হল ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া। তোমার দেশের উচ্চশিক্ষা আদৌ কোন উচ্চশিক্ষা নয়। তাই জ্ঞান অর্জনের জন্য পাশ্চাত্যে যাও।

এই র‍্যাংকিংয়ের একটি বড় লক্ষ্য যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রী আকর্ষণ করা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায়। এসব র‍্যাংকিং তাদের জন্য চুম্বকের মত কাজ করে। অক্সফোর্ডে ৪১ শতাংশ, কেমব্রিজে ৩৭ শতাংশ, এমআইটিতে ৩৪ শতাংশ, হার্ভার্ডে ২৪ শতাংশ, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে ৭১ শতাংশ এবং ইম্পিরিয়াল কলেজ লন্ডনে ৫৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বিদেশি। আবার ইউরোপের অন্য ভাষাভাষী দেশের তুলনায় ইংরেজিভাষী দেশগুলোতে বিদেশি ছাত্রের সংখ্যা বেশি।

টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ২০২০ তৈরি করার জন্য শিক্ষার পরিবেশ, গবেষণা, বিভিন্ন গবেষণার ওপর প্রভাব, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি, শিল্প-গবেষণা থেকে আয়–এই পাঁচটি এলাকার জন্য ১৩টি ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক ঠিক করা হয় এবং মোট ১০০ নম্বরকে বিভিন্ন গুরুত্ব দিয়ে নিম্নরূপ ভাগ করা হয়–

পাঠদান (শিক্ষার পরিবেশ) ৩০%	গবেষণা (পরিমাণ, আয় এবং সুনাম) ৩০%	উদ্ধৃতি (গবেষণার প্রভাব) ৩০%	আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষণা) ৭.৫%	শিল্প-গবেষণা থেকে আয় (জ্ঞান স্থানান্তর) ২.৫%
সুনাম ১৫%	সুনাম ১৮%		বিদেশি শিক্ষার্থীর অনুপাত ২.৫%	
শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ৪.৫%	গবেষণালব্ধ আয় ৬%		বিদেশি শিক্ষকের অনুপাত ২.৫%	
ডক্টরেট-ব্যাচেলর অনুপাত ৬%	গবেষণার উৎপাদনশীলতা ৬%		আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ২.৫%	

গত ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট গবেষণার সংখ্যা ১০০০-এর কম হলে এবং বছরে কমপক্ষে ১৫০টি গবেষণা না থাকলে সে বিশ্ববিদ্যালয়কে র‍্যাংকিংয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই প্রতিবেদনে ১৩৯৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সেরা মাত্র ২০০টির সুনির্দিষ্ট র‍্যাংকিং করা হয়েছে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত আটটি গ্রুপে র‍্যাংকিং করা হয়েছে–

র‍্যাংকিং	প্রাপ্ত নম্বর
২০১-২৫০	৫০.১-৫৩.৭
২৫১-৩০০	৪৬.৯-৫০.০
৩০১-৩৫০	৪৪.৫-৪৬.৮
৩৫১-৪০০	৪২.৪-৪৪.৪
৪০১-৫০০	৩৮.৮-৪২.৩
৫০১-৬০০	৩৫.৩- ৩৮.৭
৬০১-৮০০	২৮.৩-৩৫.২
৮০১-১০০০	২২.২-২৮.২
১০০০+	১০.৭-২২.১

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বর ১০.৭ থেকে ২২.১-এর মধ্যে তাদের ঢালাও র‍্যাংক হল ১০০১+। অর্থাৎ তাদের অবস্থান ১০০১ থেকে ১৩৯৮-এর মধ্যে কোথাও! তালিকায় বাংলাদেশের একটিমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এই শেষ গ্রুপে। এই র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বর নিম্নরূপ–

র‍্যাংকিং	বিশ্ববিদ্যালয়	প্রাপ্ত মোট নম্বর	পাঠদান ৩০%	গবেষণা ৩০%	উদ্ধৃতি ৩০%	শিল্প-গবেষণা থেকে আয় ২.৫%	আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ৭.৫%
১	অক্সফোর্ড, যুক্তরাজ্য	৯৫.৪	৯০.৫	৯৯.৬	৯৮.৪	৬৫.৫	৯৬.৪
২	ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি যুক্তরাষ্ট্র	৯৪.৫	৯২.১	৯৭.২	৯৭.৯	৮৮	৮২.৫
৭	হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র	৯৩	৮৯.২	৯৮.৬	৯৯.১	৪৭.৩	৭৬.৩
২৪	পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় চীন	৮২.৩	৮৯.১	৯০	৭৩.২	৮৬.৬	৫৯.৬
৩৬	টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় জাপান	৭৫.৭	৮৫.৯	৮৯.৬	৬০.৭	৭৭.৪	৩৮.২

৩৮	টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় (অস্টিন) যুক্তরাষ্ট্র	৭৫.৪	৬৮.২	৭৬.২	৯৩.২	৪৬.৬	৩৯.১
৫৩	ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তরাষ্ট্র	৭০	৬৪	৫৬.১	৯৪.৯	৩৬.৫	৬১.৪
১৩০	প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় ফ্রান্স	৫৮.৮	৫২	৩৬.১	৮৮.৩	৩৫.৬	৬৬.৬
১০০১+	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.১	১৬	৮.৮	১৬.৪	৩৬.৬	৪০.৮

প্রতিটি বিষয়ে ১০০ নম্বরের ওপর মূল্যায়ন করা হলেও নির্ধারিত গুরুত্ব (weitage) অনুযায়ী মোট নম্বর হিসাব করা হয়েছে। এভাবে হিসাব করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাপ্ত নম্বর হয় ১৬.১২। উল্লিখিত সারণিতে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিল্প-গবেষণা থেকে আয়ে অনেক নামি-দামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, যেমন–৫৩তম স্থানে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৩০ নম্বর স্থানে অবস্থিত ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, বেশি নম্বর পেয়েছে! অনুরূপভাবে 'আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি'তে ৩৬ নম্বরে অবস্থিত জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৩৮ নম্বরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিনের টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নম্বরের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে! বিষয়টা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বৈকি।

উল্লেখ্য, ১০০০+ গ্রুপে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, রাশিয়া, ভারত, পাকিস্তানসহ নানা দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। পাশ্চাত্যের এরকম মানের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী পড়তে যায়!

২

প্রথমেই পরিষ্কার থাকা দরকার যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব র‍্যাংকিং, র‍্যাংকিং পদ্ধতি এবং র‍্যাংকিংয়ের নির্ভরযোগ্যতা মোটেই প্রশ্নাতীত নয়। র‍্যাংকিংয়ের জন্য পাশ্চাত্যের নামকরা তিনটি প্রতিষ্ঠানের র‍্যাংকিংয়ের মানদণ্ড যেমন ভিন্ন, তেমনি তাদের র‍্যাংকিংয়ে প্রচুর অসংগতি দেখা যায়। যেমন–'একাডেমিক র‍্যাংকিং অব ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটিজ (ARWU)'-এর র‍্যাংকিংয়ে গত ১৫ বছর ধরে ১ নম্বরে আছে হার্ভার্ড। কিন্তু টাইম হায়ার এডুকেশন র‍্যাংকিং (THE)-র সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে হার্ভার্ডের স্থান ৭ নম্বরে। অপরদিকে THE-র র‍্যাংকিংয়ে এবার নিয়ে টানা চারবার প্রথম স্থানটি অক্সফোর্ডের। কিন্তু অজডটের সর্বশেষ র‍্যাংকিংয়ে অক্সফোর্ড আছে ৭-এ। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস (QS)-এর র‍্যাংকিংয়ে গত আট বছর ধরে ১ নম্বরে আছে MIT. কিন্তু অপর দুটি র‍্যাংকিংয়ে MIT-এর অবস্থান সব সময় ৩ থেকে ৭-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। বিভিন্ন র‍্যাংকিংয়ের এই অসংগতি এবং এ ধরনের র‍্যাংকিংয়ের নানা সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই আমাদের THE-র সম্প্রতি প্রকাশিত প্রতিবেদনটি বিবেচনা করতে হবে।

আলোচ্য প্রতিবেদনে প্রথম ২০০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অধিকাংশই ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার। একা যুক্তরাষ্ট্রেরই ৬০টি এবং যুক্তরাজ্যের ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় ঢুকেছে। টাইমস হায়ার এডুকেশন যেসব নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং করে, তাতে ইংরেজিভাষী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বেশ সুবিধা হয় বলে মনে করা হয়। আলোচ্য র‍্যাংকিংয়ে প্রথম ১০০টির মধ্যে ৬৫টি এবং প্রথম ২০০টির মধ্যে ১০৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ই ইংরেজিভাষী দেশের দেখে এবং আর্জেন্টিনা, বেলারুশ, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, ভেনিজুয়েলা, কিউবার মত দেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ১০০০টির মধ্যে নেই দেখে মনে হয় এই অভিযোগ অমূলক নয়। তাছাড়া এই তালিকায় টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাধিক্যও মান নির্দেশকগুলোর যথার্থতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। উত্তর আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার ব্যয় অত্যধিক হলেও জার্মানি, ফ্রান্স, সুইডেন, নরওয়েসহ অনেক ইউরোপীয় দেশে বিনা মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। কিন্তু কোন র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠানই শিক্ষার ব্যয়কে র‍্যাংকিংয়ের নির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করেনি। বিশ্বের অনেক দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ই পাঠদান বা গবেষণা ছাড়াও জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। যেমন–আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদান ঐতিহাসিকভাবে এখনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কোন র‍্যাংকিংই এসব বিবেচনায় নেয় না!

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া এবং অন্যান্য কাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ডের মান যাচাইয়ের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উপাত্ত বা পদ্ধতি না থাকায় বেশির ভাগ র‍্যাংকিংয়ে গবেষণার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়। বর্তমান র‍্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। তাছাড়া পাশ্চাত্যের বিশ্ববিদ্যালয় গুলোকে মাথায় রেখে তৈরি নির্দেশকগুলো আমাদের মত দেশের জন্য কতটুকু প্রাসঙ্গিক সেটাও বিবেচ্য। বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর নিজেদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই র‍্যাংকিং করা হয়। তাই এক্ষেত্রে ভুল বা বানানো তথ্য দেয়ার সুযোগ থেকে যায়। আবার গবেষণার মানের চেয়ে গবেষণার সংখ্যা ও প্রভাবের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় নানা অসাধু উপায়ে এই দুটি নির্দেশক প্রভাবিত করার প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে। কোন কোন র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও এরকম প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। কোন কোন র‍্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও আছে যে তারা র‍্যাংকিং বাড়ানোর উপায় সম্পর্কে অর্থের বিনিময়ে 'কনসালটেন্সি সার্ভিস' প্রদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন বৈশ্বিক র‍্যাংকিংয়ে ১০০০+এ থাকা কোন গর্বের বিষয় না হলেও এ ধরনের র‍্যাংকিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাজুক অবস্থান নিয়ে মাথা চাপড়ানোর প্রয়োজন আমরা দেখি না। দেখি না এই জন্য যে মাথা চাপড়ানোর আরও অনেক বড় কারণ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আছে।

৩

যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, মুহম্মদ শহীদুলাহ, রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত বিখ্যাত গবেষক-পণ্ডিতরা ছিলেন সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান নিশ্চয়ই একসময় গর্ব করার মত ছিল। পরবর্তীকালেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের সেরা পণ্ডিত, শিক্ষকরাই পড়িয়েছেন। বিভিন্ন সরকারের সময় রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের বাদ দিলে এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিবেদিতপ্রাণ, দায়বদ্ধ সেরা শিক্ষকদের অভাব নেই। দেশের সেরা শিক্ষার্থীরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক প্রশাসনিক, একাডেমিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মানের যে বিশাল ধস নেমেছে, তা বোঝার জন্য কোনো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ের প্রয়োজন হয় না।

আসলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের এই পতন কোনো আকস্মিক বিষয় নয়। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু আগেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের অধোগতির

সম্ভবত একটা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে। আজাদ পাকিস্তানের গোড়ার দিক থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও সরকারের মন জুগিয়ে চলতে শুরু করে। তাই দেখি ব্রিটিশ শাসনামলে যে বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাম্মদ ইকবাল, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রাসাদ শাস্ত্রীর মত কবি-সাহিত্যিক কিংবা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায় বা চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরামনের মত বিজ্ঞানীকে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিয়ে নিজেকে সম্মানিত করেছিল, সেই বিশ্ববিদ্যালয় আজাদ পাকিস্তানে সম্মানসূচক ডক্টরেট দিচ্ছে খাজা নাজিম উদ্দিন, ইস্কান্দার মির্জা বা সামরিক শাসক আইয়ুব খানকে!

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন অধ্যাদেশ জারি হলে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সরকারের অযাচিত হস্তক্ষেপমুক্ত থেকে কাজ করার সুযোগ তৈরি হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কখনও সেই সুযোগ গ্রহণ করার তাগিদ বোধ করেনি। তবে স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে যথেচ্ছ নতুন বিভাগ খোলা, অনাবশ্যক শিক্ষক নিয়োগ, খেয়ালখুশিমত ক্লাস নেয়ার বা খাতা দেখার স্বাধীনতা নেয়া হয়েছে ঠিকই।

শুনতে পাই এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে সিট না পেয়ে বৈধ ছাত্র-ছাত্রীদের গাদাগাদি করে তথাকথিত 'গণরুমে' থাকতে হয়; তথাকথিত 'গেস্টরুমে' হাজির হয়ে পাতি ছাত্রনেতাদের হুমকি-ধমকি সইতে হয়; ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের মিছিল-মিটিংয়ে যেতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, 'এই নির্যাতনের যূপকাষ্ঠ পেরিয়ে আমাদের শিক্ষার্থীরা যে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে সেটাই আশ্চর্যের কথা।' অথচ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নীরব! লোকে বলে সেখানে বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়–শিক্ষকরা ছাত্রনেতাদের দাপটের সামনে অসহায় আত্মসমর্পণ করেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধসহ সকল প্রগতিশীল আন্দোলনে সাহসী ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছে, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা এখন দাগি সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ-মাফিয়া। নিন্দুকেরা বলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক জ্ঞানচর্চা-গবেষণার চেয়ে তোষামোদ-দলবাজিতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োগে যোগ্যতা, পাণ্ডিত্য বা সুনামের বদলে সরকারি দলের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্যই নাকি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উদার চিন্তা, সৃজনশীল গবেষণা এবং অবাধ মত প্রকাশের সুযোগ থাকা উচিত, এখানে তা রহিত বা বাধাগ্রস্ত।

এমন পরিস্থিতিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ কোন তলানিতে যাবে, তা উপলব্ধি করতে কোন গবেষণা-জরিপের সহায়তা লাগে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের অবনতির দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে জাতির ওপর। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান খারাপ হওয়ায় এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে যাঁরা বিভিন্ন পেশায় যোগ দিচ্ছেন, সেইসব পেশার মানেরও অবনতি হচ্ছে। আর যাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষক হচ্ছেন তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত মানের শিক্ষার্থীদের তৈরি করতে ব্যর্থ হয়ে এক বিষাক্ত চক্রের জন্ম দিচ্ছেন।

এই অবস্থা এক দিনে তৈরি হয়নি। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, প্রশ্রয়, পিছু হটা, সুবিধাবাদ ও মেরুদণ্ডহীনতা আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়কে আজ এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। এই অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো এই মুহূর্তে র‍্যাংকিংয়ের পিচ্ছিল মই বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ।

চৌধুরী মুফাদ আহমদ: প্রাবন্ধিক
ইমেইল: cmahmed@gmail.com

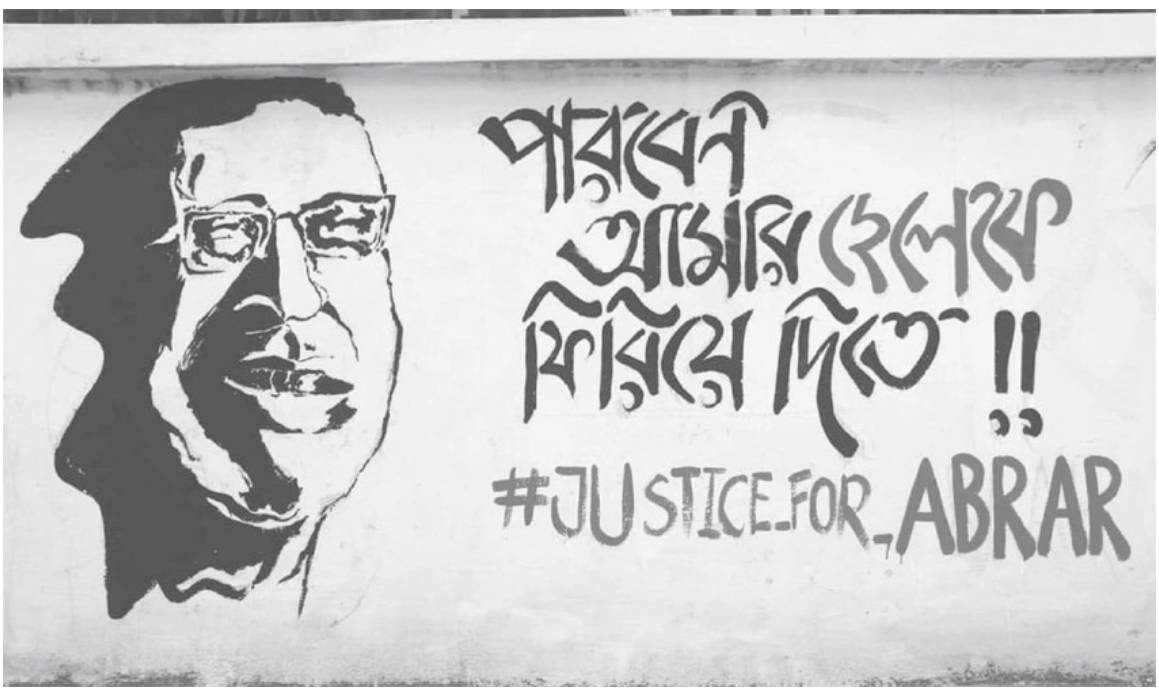

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল চিত্র, ছবি: ইন্টারনেট